অনুবাদ সম্পাদনা ঃ ডঃ রবীন্দ্রনাথ মাইতি, সংস্কৃত বিভাগ
নাড়াজোল রাজ কলেজ

প্রাচীন ভারতে লিখনের উপাদান, লিখন শিল্পী ও গ্রন্থাগার

(Writing Meterial Writers And Libraries In Ancient India)

ভারতবর্ষের লেখনশৈলীর উৎপত্তি বৈচিত্র্য পদ্ধতি লেখনের উপাদান ও প্রয়োগের ইতিহাস সুসংবদ্ধভাবে কোথাও লিপিবদ্ধ না হওয়ায় এই বিষয়ে আলোকপাত খুবই সমস্যা সংকুল। ভারতবর্ষে বহুকাল থেকেই লিপি বা লেখার প্রচলন ছিল তা নিয়ো কোনো সন্দেহ নেই। অভিলেখ রচনার উপাদান অর্থাৎ অভিলেখ যেসব আধারের উপর খোদাই করা হত পাথর, বিভিন্ন ধাতু, মৃত্তিকা, বস্ত্র ইত্যাদি। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতবর্ষে লেখনের জন্য যেসব উপাদান ব্যবহার করা হত সেগুলি বর্তমান লেখন ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষার সাহিত্যিক গ্রন্থের পুঁথি, চিঠিপত্র, অভিলেখ খোদাই করার পূর্বে রচিত খসড়া ইত্যাদি লেখার জন্য তালপত্রের ব্যবহার ছিল বহুল। তালগাছ দক্ষিন প্রদেশে সমুদ্রতীরে বিশেষ ভাবে পাওয়া যায় খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের করুদ শাসন থেকে জানা যায় যে — রাজকীয় দানপত্র তালাপাতাতে লিখেই দানপ্রাপককে দেওয়া হয়েছে। বৃহৎ পাতাযুক্ত তাল বা তাড় এবং দাক্ষিনাত্যে প্রাপ্ত তালী বা তাড়ী অর্থাৎ **Coryfa taliera** – লেখার কাজে এই দুধরনের তালপত্রেই ব্যবহার হত। তালপত্রকে লম্বালম্বি সংযোগস্থল থেকে মাঝখান দিয়ে আলাদা করে ও দুই প্রান্তে প্রয়োজনমত কেটে নিয়ে লেখার উপযোগী করে তৈরী করা হত। প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্য পন্ন বা পর্ণ কে লেখনের একটি জনপ্রিয় উপাদান বলা হয়েছে। সপ্তম শতাব্দীতে স্কন্দপূরাণ। নবম শতাব্দীতে পরমেশ্বর তন্ত্র তথা ৯০৬-৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে লঙ্কাবতার নামক পুস্তক তালপত্রে লেখা হয়েছে পরবর্তীকালে সুন্দর এবং সস্তায় কাগজের প্রচলন শুরু হওয়ার জন্য তালপত্রে লেখার চাহিদা সালে সালে কমে যায়।

ভূর্জ পত্র হল ভূর্জ বা বার্চ গাছের ছালের অভ্যন্তর ভাগ। হিমালয়ে এই গাছে প্রচুর পরিমানে উৎপন্ন হয়। ভূর্জপত্র দ্বারা নির্মিত পুস্তককে পুস্ত বাপুঁথি বলা হয়। দক্ষিন ভারতে তালপাতার প্রাচুর্য থাকায় ভূর্জপত্রের ব্যবহার কম হত। আলবিরুনি একে তূজগাছ বলেছেন। **Q. Curtius** ও ভূর্জত্বকের উপর লেখার উল্লেখ করেছেন। ভূর্জের সমার্থক শব্দ লেখন, যার অর্থ লেখা বা লিখিত নথি। মহাকবি কালিদাস 'কুমারসম্ভব' মহাকাব্য প্রেমপত্র লেখার জন্য ভূর্জপত্রের উল্লেখ করেছেন। যথা —

'ন্যাস্তাক্ষরা ধাতুরসেন পত্র ভূর্জত্বচ: কুঞ্জরাবিন্দু শৌণ:।
ব্রজন্তি বিদ্যাধরসুন্দরীণামনঙ্গলেখক্রিয়োপ্যোগম্।।'

অদ্যাবধি প্রাপ্ত প্রাচীনতম বূর্জপত্রের পুঁথি হিসেবে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকে কোটানে প্রাপ্ত খরোষ্ঠী লিপিতে রচিত প্রাকৃত ধম্মপদ এর পুঁথি উল্লেখ্য। অগরু বৃক্ষের ভেতরের ছাল উত্তর-পূর্ব ভারতে অত্যন্ত জনপ্রিয় পুঁথি উপাদান। অসমে এই ত্বক থেকে তৈরী পাতাগুলিকে সাচি পাতা বলা হয়। মোগল শাসনকালে কাগজের ব্যবহার প্রচলন থাকায় ভূর্জপত্রে লেখার চাহিদা অপেক্ষাকৃত কমে যায়।

সাধারনত বিশ্বাস করা হয় যে, চীনারা প্রথম ১০৫ খ্রীস্টাব্দে কাগজ তৈরী করে। চীনা পর্যটকদের মাধ্যমে ভারতবর্ষে

কাগজের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। অষ্টম শতাব্দীতে সংস্কৃত চীনা অভিধানে শয় কথাটি আছে যা চানা tsic শব্দের সংস্কৃতায়িত রূপ। সেখানে ককলি বা ককরির কথাও আছে যা নিঃসন্দেহে Kaghaz থেকে সংস্কৃতায়িত। গ্রীকলেখক Nearchos ৩২৭ খ্রীষ্টাব্দে পূর্বাব্দে আলেকজাণ্ডারের বারত অভিযানের সঙ্গী ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে বারতীয়রা সুতির বস্ত্র পিটিয়ে কাগজ তৈরী করত। ১২২৩ -২৪ খ্রিস্টাব্দে গুজরাতে কাগজে লেখা প্রাচীনতম অভিলেখ আবিস্কৃত হয়েছে। ১০৮৯ খ্রীস্টাব্দে অনুলিখিত শতপথ ব্রাহ্মনের একটি কাশ্মীরীয় পুঁথির উল্লেখ করেছেন। ভারতবর্ষে জলবায়ুগত কারণে কাগজে লেখা পুঁথি বেশিদিন স্থায়ী হয় না।

প্রাচীন কাল থেকেই সুতির বস্ত্রে লেখার প্রচলন ছিল। সুতির বস্ত্রখণ্ডকে পট, পাট, কার্পাসিক পটে প্রভৃতি বলা হত। এগুলি লেখার জন্য প্রয়োজনমত কেটে নেওয়া হত। গুজরাটের অনহিলবাদ পটনের একটি জৈন গ্রন্থাগারে ৯৩টি বস্ত্রখণ্ড সমন্বিত একটি পুঁথি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খিঃপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষে ভালোভাবে পিটিয়ে তৈরী করা কাপড়ে ভারতীয়রা লিখিত বলে Nearchos উল্লেখ করেছেন। শৃঙ্গেরি মঠে বস্ত্রে লিখিত গ্রন্থের বহু পুঁথি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।রেশমের কাপড়ও সুতির কাপড়ের সমান। প্রাচীনকালে রেশমের কাপড়েও লেকা হত। রেশমের মূল্য অধিক হওয়ার ফলে লেখার জন্য কস ব্যবহার করা হত। প্রাকৃতিক উদ্ভিজ উপাদানের প্রাচুর্য হেতু প্রাচীন ভারতে চামড়ার ব্যবহার খুব বেশী সংখ্যক হত না। শৈলীর পবিত্র কাজে চামড়ার ব্যবহার খুব বেশী মাত্রায় হত না। বৌদ্ধ সাহিত্যে লেখার কাজে পশুচর্ম ব্যবহারের কথা আছে। সুবন্ধুর বাসবদতায় লেখার জন্য অর্জিনের উল্লেখ আছে । ভারতে পাথরের শ্লেটের ব্যবহার শুরু হওয়ার আগে বিদ্যার্থীরা চারপায়া ফলক বা তক্তার ওপর লিখত। রাজস্থানে এই লেখনীকে বর্তনা বা বর্তা বলা হত। হিসাব, জ্যোতি, গণিত, জন্মকুণ্ডলী, বর্ষফল ইত্যাদি কাষ্ঠ ফলকের ওপর লেখা হত। বৌদ্ধের জাতক গুলিতেও ফলক নামে কাঠের ফলকের উল্লেখ আছে।

কোনো ঘটনা চিরস্থায়ী করার জন্য ওই ঘটনাকে স্তম্ভ, শিলা মূর্তির আসনপীঠ, পাথরের পাত্র ও তার ঢাকনায় উৎকীর্ণ করা হয়। শিলালেখের ওপর রাজকীয় ঘোষনা, দান, সাহিত্য, ধর্ম প্রভৃতি বিষয় লেখা হত। চৌহান রাজা বিগ্রহ রাজ এর হরকোলি নাটকের শিলা এবং সোমেশ্বর কবি রচিত ললিতবিগ্রহরাজ নাটকের শিলা অজমের রাজপুতানা গ্রন্থালয়ে সংরক্ষিত আছে। ইঁটের ওপর ও এক বা তার বেশি অক্ষর লেখা হত। ভারতে উত্তর -পশ্চিম সীমান্তে ইঁটের ওপর বৌদ্ধ সূত্র লেখা হত। স্ফটিক – এর টুকরোর ওপর ছোট্ট করে লেখা ভট্টি প্রোলু স্তুপ থেকে পাওয়া যায়। পাথর এবং ইঁটের অপেক্ষা ধাতুর ওপর লেখা খোদাই করলে তা অনেক বেশী চিরস্থায়ী হয়। সোনা অত্যন্ত মূল্যবান হওয়ার ফলে কম প্রয়োগ করা হয়। বৌদ্ধের জাতক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, ধ্বনী ব্যাপারিক এর মহত্বপূর্ণ পারিবারিক বিবরণ, রাজকীয় ঘোষনাপত্র তথা নীতিবাক্য সোনার পত্রের ওপর উৎকীর্ষ করা হত।

জৈন ধর্মের সঙ্গে সম্বন্ধিত পীতল এর বড়ো মূর্তির নীচে ছোটো মূর্তির পেছনে লেখা খোদাই করা থাকে। জৈন মন্দিরে কিছু প্লেট পাওয়া যায় এতে ধার্মিক সিদ্ধান্ত লেখা আছে। কাঁসার ঘটির ওপর মন্দিরের দাতা তথা দাতার তীথি লেখা হত। টিনের

ওপর লেখা একটি বৌদ্ধ পুস্তক ব্রিটিশ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। স্থায়ী লেখা লেখার জন্য তাম্রপত্রের প্রয়োগ করা হত। লেখন সামগ্রীর সমস্ত ধাতুর মধ্যে তামা অধিক প্রয়োগ হত। মৌর্যকালে রাজকীয় আদেশ তামার ওপর লেখা আছে। মাদ্রাসে তাম্রপত্রের ওর উৎকীর্ণ তেলেগু ভাষায় রচিত পুস্তক পাওয়া যায়।

লেখার জন্য প্রযুক্ত সাধন সামগ্রী ঃ

লেখার জন্য ব্যবহৃত নরম উপাদান যেমন তালপাতা, ভূর্জত্বক, কাগজ, কাপড়, চামড়া প্রভৃতিতে কালি দিয়ে লেখা হত। লেখার জন্য ব্যবহৃত কালিকে সংস্কৃতে মষি, মষী, মসি, মসী, মেলা ইত্যাদি বলা হত। বার্ণ (সম্ভবত ৬২০খ্রিঃ) তথা পূর্ববর্তী সুবন্ধু হর্ষচরিতম্, বাসবদত্তয়া সসির উল্লেখ করেছেন। কালি রাখার পাত্র অভিহিত হত শসী ভাজন, মেলামন্দা, খেলাম্বুকা, শশিপাত্র ইত্যাদি নামে। লেখার কালি দ্বিবিধ স্থায়ী ও অস্থায়ী। প্রথমটি পুঁথি লেখার জন্য, দ্বিতীয়টি চিঠিপত্র ও দোকানের হিসাব খাতা লেখার জন্য ব্যবহৃত হত। রঙিন কালির মধ্যে লাল কালি সবচেয়ে জনপ্রিয়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে কালিতে লেখ্য ও পাওয়া যায়। খ্রিষ্ট জন্মের আগে দেহাবশেষ ধারক স্মারক পাত্রে কালিতে লেখা একটি লেখ্য অন্ধের অঞ্চলে ধ্বংসস্তূপ থেকে পাওয়া গেছে। এটিই কালিতে লেখ্য ধম্মপদের অন্যতম প্রাচীন পুঁথি। লেখার জন্য বা অভিলেখ উৎকীর্ণ করার জন্য যেসব বস্তু ব্যবহৃত হত তাদের সবকিছুর সাধারণ নাম হল লেখনী। এই শব্দটির দ্বারা স্টাইলাস, পেনসিল, কলম, সবকিছুকে বোঝায়। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে 'বর্ণিকা' শব্দের দ্বারা কাঠের তৈরী কলমকে বোঝানো হত। বর্ণিকা শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল অক্ষর সৃষ্টিকারী। কলম শব্দটি গ্রীক থেকে আরবির মাধ্যমে সংস্কৃতে গৃহীত মনে হয়। অষ্টম শতাব্দীতে সংস্কৃত চীনা অভিধানে এটি সংস্কৃত। সিন্ধু ঘাটি সভ্যতার একটি অঙ্গ হল পুস্তকালয়। পুরানবিদ দ্বারা প্রমানিত হয় যে ২৫০০-১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বে প্রাচীন ভারতে পুস্তকালয়ের অস্তিত্ব ছিল। প্রাচীন পুস্তকালয় অধ্যয়ন ও অধ্যাপন প্রমুখের কেন্দ্র ছিল। প্রাচীন ভারতে তিন প্রকার পুস্তকালয়ের উল্লেখ আছে—

i) তক্ষশিলা, নালন্দা অধ্যয়ন কেন্দ্রের পুস্তকালয়।
ii) রাজার মহলে বিদ্যমান পুস্তকালয়।
iii) ভারতীয় মন্দিরে স্থাপিত পুস্তকালয়।

পুস্তকালয়ের ভারতীয় নাম ভারতী ভাণ্ডার ছিল যা জৈন গ্রন্থে প্রাপ্ত ছিল। মধ্যকালে রাজ্যপুস্তকালয়ে ধারা নরেশ ভোজ (১১ শতাব্দী) এর পুস্তকালয় প্রসিদ্ধ ছিল। মধ্যকালে বেনারসে এক বিশাল পুস্তকালয় ছিল। কবীন্দ্রচার্য সরস্বতীর এই পুস্তকালয় বামন এর রচিত কাব্যালংকার এর একটি হস্তলিখিত গ্রন্থ পাওয়া যায়। এতে মুঘল সম্রাট রাজ কুমার সলীম (১৬০৫ -১৬২৭ খ্রিস্টাব্দ) এর শাসকীয় মোহর লেগে ছিল। তঞ্জাবর (তঞ্জোর) এর রাজকীয় সরস্বতী মহলের পুস্তকালয়ে প্রায় ২৫০০০ পাণ্ডুলিপি সুরক্ষিত আছে। এই পুস্তকালয় ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয়। জম্মু -কাশ্মীর এর রঘুনাথ মন্দির পুস্তকালয়ে অনেক প্রাচীন গ্রন্থ আছে। সরস্বতীর ভবন পুস্তকালয়ে বারানসীর প্রায় ৭ লক্ষ সংস্কৃত হস্তলিখিত পুঁথি সংরক্ষিত আছে।

যখন কোন রচনাকার বা লেখক কবিতার মাধ্যমে নিজের ভাব প্রকাশ করে তখন তারা তা তাম্রপত্রের ওপর লিখতেন। অশোক চতুর্দশ স্তম্ভ অভিলেখে স্পষ্টভাবে বলেছেন যদি লিখিত সামগ্রীতেঅপূর্ণতা থাকে তাহলে তা লিপিকারের অপরাধ বলে মনে করা হবে।

'तत्र एतदा असमातं लिखितं अस देसं व सधास कारणं व अलांचंत्या लिपिकरापरधन व'

লেখার কাজে যুক্ত প্রাচীনতম ও সাধারণ নাম হল লেখক। অনের অভিলেখে লেখক বলতে বোঝায় তাম্রপট্টে বা প্রস্তরে দলিল বা দানপত্র উৎকীর্ণ হওয়ার পূর্ব সেই বিষয়ের খসড়া প্রস্তুতকারীকে। খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে লেখার কাজে নিয়োজিত ব্যাক্তিকে লিপিকর বলা হত। অশোকের অভিলেখে লিপিকর শব্দটি লেখক ও খোদাইকর উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। সুবন্ধু রচিত বাসব দত্তাতেও 'লিপিকর' শব্দটি লেখককে নির্দেশ করতে বোঝানো হয়েছে। সন্ধিবিগ্রহ প্রমুখ কার্যালয়ের অধিকারী হল দিবির। দিবির শব্দটির ব্যবহার খ্রিস্টীয় একাদশ দ্বাদশ শতক অবধি ব্যবহৃত হয়েছে। ধরসেন এর বলভী তাম্রপত্র অভিলেখে বিভিন্ন তথ্য স্পষ্ট জানা যায়—

'लिखितं संधिविग्रहिकस्कन्दभदेन'।

ভারতবর্ষে প্রাচীন ঐতিহ্যের তত্ত্ব ও তথ্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাম্রপত্র। ভূর্জপত্র, কাগজ, রেশম, বস্ত্র ইত্যাদি যোজনাকালের মধ্যে দুস্তর ব্যবধানের প্রকৃত সত্য নির্নয়ের অন্যতম পথ।